তৃতীয়া প্রকৃতির কথা আমরা বহুকাল জানি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মানুষের কল্যাণের জন্য এ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে যত রায় শোনা গিয়েছে, তার অনেকগুলি নিয়েই হয়তো প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে যে ন্যায়াদেশ নেমে এসেছে, সেটা অভীষ্টতম এক ইচ্ছাপূরণ। আমার কাছে এই আদেশের মূল্য আরও বেশি, কারণ এই রায় আমাদের দেশের চিরন্তনী সংস্কৃতিকে তার আধার হিসেবে বেছে নিয়েছে।

ভারতবর্ষই বোধ হয় প্রথম সেই দেশ, যেখানে অতি প্রাচীন কালে এক অতি আধুনিক সংজ্ঞা তৈরি হয়েছিল নপুংসক লিঙ্গের। সেটা এমনই একটা শব্দ, আজকের ন্যায়াধীশ যেন তার সরাসরি অনুবাদ করছেন; the third gender, মহাভারতের অর্জুন অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজনে বলেছিলেন; আমি তৃতীয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে অন্তরিত রাখব—তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ। এ এক অসামান্য দার্শনিক নির্বচন। প্রকৃতি শব্দের অর্থ মৌল অবস্থা, যেমন সোনার তাল, মাটির ঢেলা। সেই সোনা থেকে হার, কেয়ূর অঙ্গদ তৈরি হলে, কিংবা মাটির তাল থেকে থালা, বাটি, কলসি তৈরি হলে বৃহদারণ্যকের ঋষি বলবেন— এগুলো সোনা

বা মাটির বিকৃতি বা বিকার। বিকারগুলি সত্য নয়, সোনা বা মাটির তালটাই মৌল সত্য, অর্থাৎ প্রকৃতি। এই যে নপুংসকজাতীয়দের বিকার না ভেবে প্রকৃতি বলে উচ্চারণ করা—এর মধ্যে সেই নির্দিষ্ট এবং পৃথক সম্মানটুকু নিহিত আছে, যে সম্মান আছে এক জন পুরুষের এবং এক নারীর। শুধু পুরুষ বা নারীর মৌল উপাদান থেকে অন্য রকম ভাবে পৃথক এবং পূর্ণ সত্তা বলেই এঁরা তৃতীয়া প্রকৃতির মানুষ।

এই মহাভারতীয় শব্দটি অর্জুনের মুখেই প্রথম শুনলাম, এমনও নয়। আমার তো ধারণা এই শব্দ লোকের মুখে ব্যবহারিক সত্তায় চালু ছিল, তা নইলে দেখুন না কেন, সেই খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে পাণিনি যখন বৈদিক ভাষা সংস্কার করে সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখছেন, সেখানে 'আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ' লিখছেন, সেখানে 'আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ'-এর সূত্র ধরলে ক্লীব-নপুংসকদের পৃথক জীবসত্তা স্ত্রী পুরুষের সমতায় স্বীকার করে না নিলে আমাদের ভাষায় তিন কিসিমের শব্দরূপ তৈরি হত না। পশ্চিমে যান, সেখানে পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গের সন্ধান পাবেন, ক্লীবলিঙ্গ পাবেন না। কিন্তু সংস্কৃতের শব্দরূপে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দরূপ যত আছে, ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপের ভাগ কোনো অংশে কম নয়। একে নিছক ভাষাগত বৈয়াকরণী শ্রদ্ধা বলা ঠিক হবে না। পুরুষ কিংবা স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়াও ক্লীবলিঙ্গও যে অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের কাছে অন্যতম প্রধান ও পরিচিত অভিজ্ঞান তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, আমাদের চরম এবং পরম দার্শনিক তত্ত্বটিই ক্লীব—তিনি ব্রহ্ম। যিনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, তিনি ব্রহ্ম—নৈব স্ত্রী ন চ বৈ পুমান; পাণিনি ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্মের সত্তা নির্ধারণ করলেন শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিতে। চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠায় অসামান্য গান; 'ন সো রমণ না হাম রমণী', এখানে এক দেহের মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের একাত্মক প্রেমরূপ।

পাণিনির এই ক্লীবলিঙ্গ-নির্মাণে এতটাই জোর ছিল যে এক প্রেমিক কবি লিখেছেন, আমি পাণিনির ওপর ভরসা করে মন বস্তুটাকে পাঠিয়েছিলাম আমার প্রিয়ার কাছে। ভেবেছিলাম, মনের বিচলন ঘটবে না কোনও, কেননা পাণিনি বলেছেন, মন ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। কিন্তু এখন দেখছি, আমাদের শেষ করে দিয়েছেন পাণিনি, ভদ্রলোক কিছুই না বুঝে মনকে বলেছেন ক্লীবলিঙ্গ। আমি মনকে পাঠিয়েছিলাম প্রিয়ার কাছে, মন থেকে গেল সেখানেই অনন্ত রমণ-সুখে। তাই বলছিলাম, আমাদের শেষ করে দিয়েছেন পাণিনি; মনস্তত্রৈব রমতে হতা পাণিনিনা বয়ম্। আমাদের কাছে এর মর্মার্থ: পাণিনি অন্তত এটা বুঝেছেন যে, শুধু স্ত্রী আর পুরুষ নয়, ক্লীবেরও একটা মন আছে; পাণিনি এই শব্দের ক্লীবত্ব নির্ধারণ করে এই মর্যাদাটুকু দিয়েছেন অন্তত; স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে।

তৃতীয় প্রকৃতিতে ফিরে এসে বলি, পাণিনির কালের বহু আগে ক্লীব-নপুংসকদের পৃথক মর্যাদা সমাজে নিহিত ছিল বলেই বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রেও তৃতীয় লিঙ্গ-বিনির্মাণের পদ্ধতিটি অতি বৈজ্ঞানিক ভাবনায় ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। এবং সেটাও খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীতে। দৃষ্টিভঙ্গির কতটা সূক্ষ্মতা থাকলে সেই কালে লিঙ্গ-ভাবনার

নিদান ধরে এটা লেখা যায় যে, তৃতীয় প্রকৃতি বা Third sex হল দু'রকমের— স্ত্রীরূপিণী এবং পুরুষরূপী। স্ত্রীরূপিণী প্রকৃতির মধ্যে মেয়েদের হাবভাব, ছলাকলা বেশি প্রকট হয়ে ওঠে এবং তাদের চেহারার মধ্যেও কথঞ্চিৎ স্তনোদ্গম থেকে আরম্ভ করে বেশবাস, চুল বাঁধা, লীলায়িত ধীরগমন ইত্যাদি থাকে। আর পুরুষরূপী তৃতীয়া প্রকৃতির মধ্যেও রমণীয় নির্মোকের ওপর ঈষৎ দাড়ি-গোঁফে পৌরুষের স্বভাব প্রকাশ পায়। বাৎস্যায়ন এদের রতিক্রিয়ার পদ্ধতি নিয়ে যে বিচার করেছেন, তা আমাদের কাছে খানিক অন্য রকম হলেও খ্রিস্টপূর্বকালে তিনি তাদের নিয়ে গভীর ভাবে ভেবেছেন, এটাই বড় কথা, এবং ফুকো-র মতো দার্শনিক সেটা পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ না করলে আজও বুঝি আমরা বাৎস্যায়নের মর্যাদা বুঝতাম না।

প্রসঙ্গত, বাৎস্যায়ন যে সমকামী পুরুষদের বৈকল্পিক রতিক্রিয়ার কথা সহানুভূতি নিয়ে ভেবেছেন, সেটা প্রধানত পুরুষরূপী তৃতীয়া প্রকৃতি। কিন্তু ক্লীবত্বের অভিজ্ঞানে স্ত্রীরূপিণী প্রকৃতিকেই সাধারণ্যে যে ক্লীব বলা হত সেটা নপুংসক শব্দটা থেকেই যেন বেশি প্রমাণিত হয়। বিশেষত প্রাচীন কালে তাঁদের সম্মানও খুব কম ছিল না। তবে সম্মানের থেকে সহানুভূতির ভাগ ছিল বেশি। সেই সহানুভূতির দৃষ্টি থেকেই একটা কাহিনি আরোপিত হয়েছে রামায়ণে। কথিত আছে, রামচন্দ্র যখন বনবাসের পথে, তখন সমস্ত প্রজাবর্গ রামচন্দ্রের সঙ্গে বনের পথ ধরেছিল। একটা জায়গায় এসে রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীদের ফিরে যেতে বললেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। রামচন্দ্রও চলে গেলেন তার পর, স্ত্রী-পুরুষেরাও ফিরে গেছেন অযোধ্যায়। অবশেষে লঙ্কাকাণ্ডের পর রামচন্দ্র যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন অযোধ্যার কাছাকাছি এসে রামচন্দ্র দেখলেন, ক্লীব নপুংসকেরা সব দাঁড়িয়ে আছেন রামচন্দ্রের অপেক্ষায়। তাঁদের শরীর কৃশ, মাথার চুলে জটা, গায়ে ময়লা জমেছে। রামচন্দ্র বললেন, তোমরা এখানে এ ভাবে দাঁড়িয়ে কেন? তাঁরা জানালেন আপনি স্ত্রী-পুরুষদের ফিরতে বলেছিলেন অযোধ্যায়, আমাদের তো ফিরতে বলেননি, তাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তাঁদের ধৈর্য ও ভালবাসা দেখে রামচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, এর পর থেকে তোমরা মঙ্গল-কর্মের সূচক হবে। লোকে বলে, বিবাহ-পূর্ব 'বাধাই' অনুষ্ঠানে হিজড়েদের ভূমিকা মঙ্গলের সূচনা করে। সন্তান-জন্মের পর বাড়িতে তাঁদের আসাটাও মঙ্গলের সূচক।

রামায়ণে আরোপিত বলে মনে হলেও এটি বহুলপ্রচলিত কাহিনি। এই কাহিনি একটা সংকেত দেয় যে, এই তৃতীয়া প্রকৃতিকে আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। রামচন্দ্র তাঁর ভুল সংশোধন করেছেন এবং অন্তত লৌকিক উৎসব গুলিতে আমরা যেন তাঁদের ভুলে না যাই, সে জন্য আমাদেরও সচেতন করেছেন। এমনিতে দেখেছি, রাজবাড়ির প্রথম রাজদর্শন পর্বে যাঁরা মঙ্গলকার্যে নিযুক্ত হতেন, নপুংসকজনেরা সেখানে রাজবাড়ির অন্তরঙ্গ পরিচারিকাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে অবস্থান করতেন। এখানে অবশ্য তাঁদের পর্য্যায় শব্দ হল বর্ষবর—স্ত্রী-বর্ষবর ভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্যথা পুরা। হর্ষবর্ধনের লেখা *'রত্নাবলী'* নাটকেও এই

কথিত আছে, রামচন্দ্র যখন বনবাসের পথে, তখন সমস্ত প্রজাবর্গ রামচন্দ্রের সঙ্গে বনের পথ ধরেছিল। একটা জায়গায় এসে রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীদের ফিরে যেতে বললেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। রামচন্দ্রও চলে গেলেন তার পর, স্ত্রী-পুরুষেরাও ফিরে গেছেন অযোধ্যায়। অবশেষে লঙ্কাকাণ্ডের পর রামচন্দ্র যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন অযোধ্যার কাছাকাছি এসে রামচন্দ্র দেখলেন, ক্লীব নপুংসকেরা সব দাঁড়িয়ে আছেন রামচন্দ্রের অপেক্ষায়। তাঁদের শরীর কৃশ, মাথার চুলে জটা, গায়ে ময়লা জমেছে। রামচন্দ্র বললেন, তোমরা এখানে এ ভাবে দাঁড়িয়ে কেন? তাঁরা জানালেন আপনি স্ত্রী-পুরুষদের ফিরতে বলেছিলেন অযোধ্যায়, আমাদের তো ফিরতে বলেননি, তাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তাঁদের ধৈর্য ও ভালবাসা দেখে রামচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, এর পর থেকে তোমরা মঙ্গল-কর্মের সূচক হবে। লোকে বলে, বিবাহ-পূর্ব 'বাধাই' অনুষ্ঠানে হিজড়েদের ভূমিকা মঙ্গলের সূচনা করে।

বর্ষবর শব্দটা নপুংসক অর্থে আছে এবং তাঁরা রাজবাড়ির অন্দরমহলে রক্ষকের কাজ করতেন; একই কথা আছে কৌটিল্যের *'অর্থশাস্ত্র'*য়, কিন্তু তিনি 'বর্ষবর' না বলে শব্দটাকে ধরেছেন 'বর্ষধর' বলে, সাহেবসুবোজনেরা তার ইংরেজি করেছেন holder of rains! এ সব মানুষের জন্য কষ্ট হয়।

'বর্ষ' বলতে এখানে বর্ষা-বৃষ্টি বোঝায় না, বরঞ্চ রেতঃসেক নিবারণ করতে পারেন অথবা রেতোবর্ষণ আবৃত, রুদ্ধ থাকে এমন মানুষেরাই বর্ষবর অথবা রেতোবর্ষণ ধারণ করে থাকেন বলে বর্ষধর। যেমনটা কৌটিল্যে। প্রাচীন কোষকার অমরসিংহ বর্ষধর শব্দটি ধরেছেন, টীকাকারেরা এখানে ভরতের *'নাট্যশাস্ত্র'* উদ্ধার করে বলেছেন, বর্ষবরেরা ক্লীবই বটে, তবে অল্পপ্রাণশক্তিসম্পন্ন, তাঁদের স্বভাব মেয়েদের মতো, কিন্তু তাঁদের ওপর শূদ্র-বৈশ্যের জাতিদোষ চাপানো যায় না। অর্থাৎ এখানেও তাঁদের তৃতীয়া প্রকৃতি সত্তাকে সম্মান জানিয়েই অন্তঃপুরে বিশ্বস্ত কাজে নিযুক্ত করতেন রাজারা। ঠিক এই রকমই আরও একটা পুংলিঙ্গ শব্দ আছে 'ষণ্ঢ' বা 'শণ্ঢ'। মহাভারতে বহু বার এই শব্দ ব্যবহার হয়েছে, সেখানে ক্লীবত্বের থেকেও তাঁদের প্রজননের অক্ষমতার ওপরে জোরটা বেশি। ষণ্ঢ কথাটা

লোকমুখর মৌখিকতার মধ্যে এতটাই ছিল যে, অনেক সময় কৃষিপণ্য সম্পর্কে এই শব্দটি বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে; যেমন যে তিলের অন্য তিলগাছ উৎপাদন করার ক্ষমতা নেই, তাকে ষণ্ঢ-তিল বলা হয়েছে। এই শব্দটা মহাভারতের দুঃশাসন-কর্ণরা ব্যবহার করেছেন পাণ্ডবদের ওপর। পাশাখেলায় প্রতিজ্ঞা করে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পর্যন্ত হেরেছেন, সেই অবস্থায় প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয়ে কোনও কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছেন না, তখন দ্রৌপদীকে যাচনা করে দুঃশাসন বলেছিলেন, তুমি আমাদের মধ্যেই কাউকে বরণ করে নাও। তোমার এই স্বামীরা এখন ষণ্ঢ-তিলের মতো উৎপাদন-ক্ষমতাহীন—বিপর্যয়ে ষণ্ঢতিলা ইবাফলাঃ।

বৃহন্নলা

ক্লীব-নপুংসকদের এই পর্যায় শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বিদেশি পণ্ডিতরা কখনো gay কখনো homosexuality-র আধার হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার কোনও ভাষাগত অর্থগত যুক্তি-শুদ্ধি নেই। প্রাচীনেরা সমকামিতার কথা জানতেন, ভালই জানতেন, কামসূত্রকার তাঁদের রতি-তৃপ্তির কথাও ভেবেছেন, জীবিকার কথাও ভেবেছেন, কিন্তু সেগুলি সবই তৃতীয়া প্রকৃতির পর্যায়বাচিতায়। তিনিও কিন্তু ক্লীবত্ববাচক এই শব্দগুলির কয়েকটিকে সমকামিতার ভাবনায় ভাবাননি, এগুলি পণ্ডিতম্মন্য আবিষ্কর্তা গবেষকদের আত্মলাভমাত্র। সবই ব্যাদে নাই।

শুধু ক্লীব-নপুংসকদের প্রসঙ্গেই সাধারণ ভাবে স্থিত থাকি, তা হলে বলব, যৌন অক্ষমতার জন্য রাজবংশে উত্তরাধিকার তৈরি হবে না বলে প্রাচীনেরা তাঁদের রাজত্বে বরণ করতে চাননি, ঠিক যেমন ক্লীব স্বামীর সঙ্গে না জেনে বিয়ে হলে বিবাহিত রমণীরও পুনর্বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন ধর্মশাস্ত্রকারেরা। কিন্তু এই প্রজনন অক্ষমতার জায়গাটা বাদ দিলেও নপুংসক ক্লীবদের সামাজিক মর্যাদা কিছু কমেনি। যে অর্জুন অজ্ঞাতবাসের সময় স্ত্রী-প্রকৃতির নপুংসক সেজে বিরাট-রাজার অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদের

নাচ শেখানোর কাজ নিয়েছিলেন—কন্যানাং নর্তকো যুবা—সেই অর্জুনের নামটার মধ্যেও একটা গৌরব আছে। বৃহৎ শব্দটা মহান এবং বৃহদর্থেই গৌরবে ব্যবহার হয়, যেমন বৃহদারণ্যক। একই ভাবে বৃহৎ + নরা = বৃহন্নরা (বৃহন্নলা, সংস্কৃত এবং হিন্দিতে র-এর বদলে ল বসে অনেক জায়গায়), কিন্তু মানেটা হল অন্য রকমের সম্মানিত মানুষ, তৃতীয়া প্রকৃতি—স্ত্রী ভাবে ছিলেন, তাই অর্জুন বৃহন্নলা।

মহাভারতে অম্বা শিখণ্ডিনী স্ত্রীভাবিনী থেকে যে ভাবে পুংভাবিত শিখণ্ডী হলেন, সেটা তো transexuality-র ক্ষেত্রে ইতিহাস তৈরি করেছে। 'কাস্ট্রেশন' নয়, এক মেয়ে স্ত্রীরূপ থেকে রূপান্তরিত পুরুষে পরিণত হচ্ছে, যক্ষ স্থূণাকর্ণের সঙ্গে একটা sex-exchange যে ভাবে রূপান্তরের ঘটনা ঘটাচ্ছে, সেটা mythical plane-এ থাকলেও তাৎপর্যপূর্ণ। দা ভিঞ্চি-র এরোপ্লেনের ছবি আঁকার মতো এই রকম ভেবে ওঠাটাই সত্যের প্রাগ্‌ভাষণ। অম্বা শিখণ্ডিণীর পুরুষ হয়ে ওঠার তপস্যাটা এমনই যে, কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধা-বীরেরা লাইন দিয়ে দাঁড়ালে সগর্বে ঘোষণা করতে হয়: এখানে আছেন শিখণ্ডীর মতো মহাধনুর্ধর যোদ্ধা—শিখণ্ডী চ মহারথঃ। ধুন্ধুমার যুদ্ধের সময় শিখণ্ডীর সেই লব্ধপৌরুষ জেদের কাছেই মাথা নুইয়ে দিয়েছেন ভীষ্ম পিতামহ— তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি অন্তরিত কোনো দুর্বলতায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০-০৪-২০১৪